দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

FEB 1987
৬ কলাম

03

দৈনিক বাংলা

শিশু বিদ্যালয়

রাবেয়া সিরাজ

বেশকিছু দিন ধরেই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। এ নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী মহলের উচ্চ পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই। সত্য কথা বলতে কি, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন এক পর্যায়ে সমাসীন যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার ধারা সঠিক খাতে প্রবাহিত কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত বলতে পারছি না। আবার নীতি প্রণয়ন সম্ভব হলেও তা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগী কি না অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে যথাযথভাবে ফলপ্রসূ করে তোলা যাবে কিনা তাও নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। এমন অবস্থায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন আছে তার উপরই সামান্য আলোকপাত করা যাচ্ছে।

বক্তব্যের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ধরা যাক। সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চাচ্ছেন। বাংলাদেশের মত দারিদ্র অথচ উন্নয়নকামী একটি দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই শুভ উদ্যোগ আমার মত আরো অনেকের মনেই আশার উদ্রেক করে। কারণ বর্তমান দিনের শিশুরাই আমাদের আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ জনসম্পদ। তাই শিশু-সম্পদ নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান মতে দেশে চল্লিশ হাজারেরও অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পত্তন ঘটেছে। আগামী কয়েক বছরের ভেতর দেশে আরো পঁচিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঠিক কত হবে সঠিকভাবে জানা না গেলেও দেশে প্রতিষ্ঠিত কম-বেশি চল্লিশ হাজার মত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাতে শিক্ষক হিসাবে যাঁরা নিয়োজিত তাঁরা আমাদের জনসম্পদ গড়ে তোলার প্রধান কারিগর বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। কিন্তু আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, জনসম্পদ গড়ার এই প্রধান কারিগর বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। আবার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হলেও শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্থানীয় ও বিভিন্ন মহলের উৎপাত, আর্থ সামাজিক অবস্থান, নিজেদের স্বল্প মেধা ও অন্যান্য কারণে তাঁদের ভেতর ঠিক কতজন শিক্ষকের মহান দায়িত্ব পালন করতে পারেন তা জানা খুব একটা সহজ নয়। তবে আশা করা যায় সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষক নিযুক্তির প্রশ্নে তারা পেশাগত দায়িত্বের উপযোগী কি না এ সম্বন্ধে তাঁদের শিক্ষাগত ও অন্যান্য মান যাচাই করে নেয়া হয়। আর যদি তা যাচাই করে না নেয়া হয় তবে যা হবার তা হচ্ছে। একদিকে যেমন শিক্ষকের শিক্ষা বা জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্য, অন্যদিকে তেমনি শিশুর শিক্ষা বা জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। এনিয়ে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য স্তর বিভাগ, পাঠ্যক্রম, শিশু মনমানসিকতা, শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এর কোনটাই আজ আমার বক্তব্যের বিষয় নয়। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, যিনি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি তাঁর পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবেন।

এই প্রসঙ্গে ইদানীং দেশের যেখানে-সেখানে কিন্ডার গার্টেন মন্টেসরী, প্রিপারেটরী, প্লে গ্রুপ, নার্সারি নামে বিভিন্ন ধরনের প্রি-প্রাইমারী বা প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন ধরনের স্কুলের যেভাবে পত্তন ঘটছে তা নিয়ে কিছু না বলে পারছি না। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হয়তো বা দেশে আরো অধিক শিশু বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচী সমতা বিধান দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা শিক্ষা বিভাগের উপর বর্তায় কিনা এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট কারণ আছে। এ ধরনের শিশু বিদ্যালয়গুলোর যেমন নামের বাহার তেমনি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি-র ক্রমবর্ধমান হার দেখে সাধারণ অভিভাবকদের মূর্ছা যাবার উপক্রম। অবশ্য অনেকের জন্য আবার তা আভিজাত্য প্রকাশের স্থানও বটে। তবে আমি বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী টাকাওয়ালা অভিভাবকদের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি, বাংলাদেশের অধিকাংশ অভিভাবকদের কথা, যাদের আয় দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় কোনমতেই তাঁদের সন্তানদের নিয়ে এ ধরনের বিদ্যালয়ের ধারে কাছে পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু তাঁদের ছেলে-মেয়েরাও এই মন্টেসরী, প্রিপারেটরী বা নার্সারি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তাদের স্কুলের খরচ যোগাতে অভিভাবকদের হিমশিম অবস্থা কিনা অথবা ব্যতিক্রম পথে আয়ের উৎস সন্ধান করতে হচ্ছে কিনা, আমার বক্তব্যের বিষয় তা নয়, আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, এ ধরনের শিশু-বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট জরিপ করা প্রয়োজন। সরকারী বিধি ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচীরও প্রয়োজন আছে। কেবল ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নয়, দেশের শিশু সম্পদকে জনসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার শুভ ইচ্ছা নিয়েই যেন এ ধরনের প্রস্তুতিমূলক শিশু বিদ্যালয়ের পত্তন করা হয়। বাংলাদেশী শিশুদের যেন বাংলাদেশী শিশু হিসাবে গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। বেতন ও অন্যান্য ফি বাবদ যা ধার্য করা হয় তাতে যদি শুধু মাত্র ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটে তবে এ দেশের সরকারের দেশের সব ধরনের বিদ্যালয়েরই সুষ্ঠু জরিপ করে, সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় বেতন ও অন্যান্য ফি পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে দেবার যথাযথ সময় হয়েছে। তা না হলে আমাদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা রীতিমত প্রহসনে এসে দাঁড়াবে।

সবশেষে বলবো—২১শে ফেব্রুয়ারী, ৮ই ফাল্গুন বা আমাদের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব যদি আমাদের মনে স্বদেশ ও মাতৃভাষার বিন্দুমাত্র অনুরাগের সৃষ্টি করে থাকে তবে নিশ্চয় এদেশের জনগণের সরকার দেশের শিশু-সম্পদের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি দিতে গিয়ে তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরবেন।